চেতনাবোধ

---আসিফা নাহীদ

আজ হঠাৎ করে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে মুশতাক সাহেবের মাথায়। এ জীবনে কখনও কোনদিন এত অপমানিত, এত নীচ কখনও বোধ করেননি তিনি। সারা জীবন মাথা উঁচু করেই চলতে জেনেছেন তিনি। আজ যখন তাঁর অতি আদরের একমাত্র মেয়ে মোনা স্বামীর বাড়ী থেকে চলে এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, এত বছরের সব অহঙ্কার, অহমিকা যেন মুহূর্তে চুরমার হয়ে গেল তাঁর। বার বার অনেক দিন আগের, অত্যন্ত কাছের একজনের করুণ, বিষন্ন চেহারা তাঁর চোখে ভেসে উঠতে লাগল। কে যেন ঠিক এমনি করে কাঁদত অনেক বছর আগে? কার সাথে হুবহু মিল দেখছেন তিনি তাঁর মেয়ের? ভীষণ ভাবে চমকে যান মুশতাক সাহেব। মেয়ের এ চেহারা তো অবিকল তার মায়ের প্রতিকৃতি। অনেক অনেক বছর আগে ঠিক এমনি করুণ চোখের পানিতে প্রতিদিন বালিশ ভিজাতেন মুশতাকের স্ত্রী রাফিয়া। সেদিনকার স্বামী মুশতাকের হৃদয় ঐ অশ্রুতে নিশ্চল, নির্বিকার থাকলেও পিতা মুশতাকের হৃদয় আজ কন্যার হাহাকারে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছে। তবে কি স্ত্রীর অভিশাপে অভিশপ্ত তিনি? তাঁদের নিজেদের গর্ভজাত কন্যাও রক্ষা পেলনা সে অভিশাপের কালো হাত থেকে?

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তৎকালীন ঢাকা শহরের এক অত্যন্ত অভিজাত পরিবারের ছেলে মুশতাক গভীর প্রেমে পড়ে যায় সহপাঠী রাফিয়ার। দু'জনেই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করছে। নজরকাড়া রূপসী না হলেও অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া এ মেয়ের দিকে ক্যাম্পাসের অনেক ছেলেরই দৃষ্টি ছিল। যেমনি নিষ্পাপ চেহারা এ মেয়ের, তেমনি নিষ্পাপ ভঙ্গী। লেখাপড়া, নামাজ-কালাম আর মানুষের সাথে ভাল ব্যবহারই ছিল ওর জীবনের মন্ত্র। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের এ মেয়ের জন্য যখন মুশতাকের বাবা-মা তাঁদের ছেলের সাথে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তখন খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন রাফিয়ার বাবা-মা। এত নামকরা পরিবারের ছেলে সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে একটুও সময় লাগেনি তাঁদের। ঠিক তাঁদের মেয়ের মাপের ভাল ছাত্র না হলেও ক্লাসের প্রথম দিকেরই একজন মুশতাক। স্বভাব চরিত্রেও কোন খুঁত পেলেননা তাঁরা। কিন্তু ছেলের স্বভাবের একটি দিকের আভাস পেয়ে আঁতকে উঠলেন তাঁরা। ছেলে এবং তার গোটা পরিবার অত্যন্ত অহঙ্কারী। অহমিকার জোরে ক্লাসের কোন ছেলের সাথে তেমন বন্ধুত্ব পর্যন্ত নেই মুশতাকের। সবাইকেই বংশ মর্যাদার দিক থেকে ছোট মনে করে ও, যেটা নাকি ওর বাবা-মায়েরও স্বভাব। খুঁজে খুঁজে শহরের কিছু ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের নম্র, শান্ত স্বভাবের মেয়েদেরকে পুত্রবধু করাই তাঁদের রেওয়াজ, যেন শ্বশুরবাড়ীর কোন কিছুর প্রতিবাদ তারা না করতে পারে। ঐ বিখ্যাত পরিবারের বৌ হবার পর অনেক মেয়েরাই নাকি স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনা শুনতে শুনতে অত্যন্ত অসুখী অবস্থায় জীবনপাত করেছে।

এসব কথা শুনে রাফিয়ার বাবা মা চরম আপত্তি জানান বিয়েতে। কিন্তু কথায় বলে, ভাগ্যের লিখন কেউ খন্ডাতে পারেনা। ছেলের খোঁজ খবর চলছে, এমনি এক সময়ে রাফিয়ার বাবা আক্রান্ত হন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। বড় জোর আর ছয় মাস বাঁচবেন বলে ডাক্তাররা রায় দেন। রাফিয়ার পরেই পিঠাপিঠি বিবাহযোগ্য আরও দু'টি মেয়ে রয়েছে। আর তাছাড়া পৃথিবীতে কেউই দোষমুক্ত নয়। অন্য কারও সাথে বিয়ে হলে তারও যে এর চেয়েও বড় কোন দোষ থাকবেনা, সে

নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? মুশতাকের বাবা-মায়ের জোরাজোরি আর আত্মীয়-স্বজনের বুঝানোর ফলে রাফিয়ার বাবা মা শেষ পর্যন্ত শুভদিন দেখে মেয়েকে তুলে দেন মুশতাকের হাতে।

বিয়ের রাতেই রাফিয়া বুঝতে পারে কতখানি ঠিক ছিল তার বাবা-মায়ের আশঙ্কা। তাঁদের দেয়া গহনা, শাড়ী, জুতা, স্যুট এবং অন্যান্য সব জিনিসের খুঁত ধরা শুরু করলেন রাফিয়ার শ্বশুরবাড়ীর মানুষজন। এমনকি এ কথাও তাঁরা বলতে ছাড়লেননা যে বড় সস্তায় রাফিয়ার বাবা-মা এমন একটি দামী জামাই পেয়ে গেলেন। যাকে ছেলের বউ করার জন্য তাঁরা এতদিন হন্যে হয়ে ঘুরেছেন, তাকে পাবার সাথে সাথে যেন তাঁদের রূপ বদলে গেল। বিয়ে বাড়ীর সব চাকচিক্য আর জাঁকজমক মুহূর্তের মধ্যে যেন বৃথা হয়ে গেল রাফিয়ার কাছে। আর মুশতাক, যার একটু মমতা মাখানো কথায় রাফিয়া ভুলে যেতে পারত তার সব দুঃখ এবং ব্যথা, সে রাফিয়ার মনে দ্বিগুন আঘাত হানল। নিজ থেকে মুশতাক রাফিয়াকে মনে আঘাত দেয়া কোন কথা তেমন না বললেও তার বাবা-মায়ের বিদ্রূপকে নীরব সমর্থন দিত। তার আক্রোশ ছিল রাফিয়ার বাবা মায়ের উপর, তাঁরা এ বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন বলে। সেসব অপমান আর আক্রোশ তার ব্যবহারে মাঝে মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। রাফিয়ার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর ছিল যখন মুশতাক বারবার রাফিয়ার বাবা মায়ের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে লাগল আর রাফিয়া একা বাবা বাড়ীতে গেলে মুশতাক মুখ কাল করে রাখত। সবকিছুই ঠিক থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত রাফিয়ার বাবা মায়ের নাম বাসায় না তোলা হয়। মুশতাক রাফিয়াকে সুন্দর শাড়ী-গহনা কিনে দেয়, এমনভাবে সব কিছু পরিচালনা করে যেন রাফিয়া কোন কিছুর অভাব বুঝতে না পারে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেনা রাফিয়ার সবচেয়ে বড় অভাব। যে বাড়ীতে বাবা মায়ের নাম তুললেই কুরুক্ষেত্র বেঁধে যায়, সে বাড়ীর সোনার সিংহাসনে রাফিয়াকে বসিয়ে রাখলেও যে সে সুখী হবেনা, তা মুশতাক বুঝতে পারেনা, এমনকি বুঝতে চায়ওনা। কত রাত রাফিয়া শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিত, মুশতাক তা দেখেও দেখতনা।

ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী রাফিয়ার মাঝে মাঝে মনে হত এ সংসার ছেড়ে চলে যেতে কিন্তু বাবা-মায়ের কষ্ট হবে ভেবে সে পদক্ষেপও সে নিতে পারতনা। মনের ভিতরটা ওর হাহাকার করে উঠত মায়ের কোলে মাথা রাখবার জন্য, প্রিয় বোনদের সাথে বিকেলে আড্ডা জমাবার জন্য আর অসুস্থ বাবার করুণ চোখের পানি মুছে দেবার জন্য। কিন্তু এই কঠিন সংসার জীবনে কার মনের হাহাকার কে শোনে?

বিয়ের দেড় বছরের মাথায় মুশতাক আর রাফিয়া পাড়ি জমায় যুক্তরাজ্যে, সেখানকার London School of Economics মুশতাককে PhDর Admission Offer দেয়। ততদিনে রাফিয়ার বাবা পরলোকগমন করেছেন। রাফিয়ার মাস্টার্সের ফলাফল অনার্সের মত অত ভাল না হলেও ভালর দিকেই। রাফিয়া নতুন আশায় জীবন শুরু করে। ভাবে, নতুন জায়গার নতুন পরিবেশে এসে ওরা দু'জনেই হয়তো পুরাতন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলে যাবে। আর তাছাড়া এখানে ওর বাবা-মাও নেই, তাঁদের বাসায় যাবার প্রশ্নও উঠবেনা, ফলে ঝগড়াও কম হবে। প্রায় প্রতি weekend এই ওরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে বের হয়; Regents Park, British Museum, Madame Tussaud's Museum, Buckinghum Palace, কোথাও যাওয়া বাকী রাখেনা ওরা। বৃটিশদের পুরোনো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রাণময় চেষ্টা দেখে অভিভূত হয় রাফিয়া। প্রথম দু'তিন মাস বেশ ভালই কাটে ওর। কিন্তু এরপরই শুরু হয়ে যায় ওর homesickness। মুশতাকের উন্নাসিক আচরণের জন্য কোন বাংলাদেশী পরিবারের সাথেই ওদের বন্ধুত্ব হচ্ছিলনা। সবার আচরণেই কোন না কোন খুঁত ধরে বেড়াবে মুশতাক আর নিজের অভিজাত পরিবারের সাথে তুলনা করে সবাইকে ছোট করবে। মা-বোনদের সাথে রাফিয়ার ফোনে কথা হয় তিন\চার মাসে

একবার, তাও হয়তো মাত্র মিনিট দশেকের জন্য। পার্ক, মিউজিয়াম আর লাইব্রেরী ঘুরে কতই বা আর সময় কাটে? আর তাছাড়া মুশতাকও প্রচন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার পড়ালেখা নিয়ে। আবার শুরু হয় রাফিয়ার অতীত যন্ত্রনা। লন্ডনে এসে প্রথম প্রথম মুশতাককে অনেকটা আপন আর নিজ করে পাবার অনুভূতি ধীরে ধীরে দুরে সরে যেতে থাকে। একাকীত্ব এসে ওকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। এমনি অসহ্য একাকী জীবনে একদিন রাফিয়া আনন্দের সাথে আবিষ্কার করে যে ওর কোল জুড়ে আসছে নতুন অতিথি; সে গর্ভবতী। আবার নতুন আশার আলো খুঁজে পায় সে। মুশতাকও খুব খুশী, বংশে নতুন একজনের আগমনে। রাফিয়া মনে মনে ভাবে, এবার বুঝি মুশতাক বুঝতে পারবে, বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক কত আপন! কন্যা সন্তান জন্ম হলে আরও ভাল হয়, কেননা একদিন এ সন্তানও পরের ঘরে চলে যাবে আর তখন মুশতাক বুঝতে পারবে রাফিয়ার সব জ্বালা, সব কষ্ট।

রাফিয়ার ধারণা ঠিকই ছিল কিন্তু সে মুশতাকের পিতৃরূপ দেখবার আগেই এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। কন্যা মোনাকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে রাফিয়া চিরদিনের জন্য দুরে সরে যায় সবার কাছ থেকে, অনেক অনেক অভিমান নিয়ে।

এই মোনাকে দিয়েই আমার গল্প শুরু হয়েছিল। স্বামী হিসেবে ব্যর্থ হলেও বাবা হিসেবে মুশতাক সাহেবের কোন ত্রুটি ছিলনা। প্রানের চেয়েও বোধকরি প্রিয় ছিল এই মেয়ে তার কাছে। সৎ মার কাছে মেয়ের কষ্ট হবে, এ ভেবে তিনি আর কখনও বিয়ে শাদীও করেননি। আর দশটি মেয়ের মত একদিন মোনাও বড় হল, তার জীবনেও আসল প্রেম, ভালবাসা। মেয়ের পছন্দের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল মুশতাক সাহেবের। তাই এতটুকু আপত্তি জানাননি তিনি মোনাকে তার ভালবাসার মানুষের হাতে তুলে দিতে। মেয়েকে বিয়ে দেবার পর থেকেই তিনি টের পেতে থাকেন মেয়ে যেন অতি দ্রুত তাঁর কাছ থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। জীবনে প্রথমবারের মত একাকী, বন্ধুহীন আর অসহায় মনে হতে থাকে নিজেকে তাঁর। মোনার ছোটবেলার খেলনা আর বইগুলো প্রায়ই নাড়াচাড়া করেন তিনি আর মনে মনে অবাক হন মোনা তার এত প্রিয় বাবাকে এত কম দেখতে আসে বলে। আর জামাতা নাসিরের সাথে সেই বিয়ের আসরের পর ধরতে গেলে কোন কথাই হয়নি। তাঁর মেয়ে খুব বেড়াতে ভালবাসে আর ভালবাসে টক-মিষ্টি আচার খেতে। মুশতাক সাহেব লন্ডনের ভারতীয় দোকান থেকে সবসময় মোনার জন্য আচার কিনে রাখতেন। মোনার স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ী কি খেয়াল রাখে তাঁর মেয়ের এই পছন্দের জিনিসগুলোর দিকে? অবসর সময়ে মুশতাক সাহেবের এসব নানা কথা মনে হয় আর তিনি অপেক্ষায় থাকেন, কবে মেয়ে আর জামাইয়ের সাথে দেখা হবে তাঁর।

বিয়ের এক বছরের মাথায় মোনা সত্যিই চলে আসে তাঁর কাছে। এসেই সে বাবার কোলে সেই ছোটবেলার মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কথায় কথায় নাকি তার আদরের বাপীকে শ্বশুর-শাশুড়ী গালমন্দ করে। বাপীর কথা তুললেই বাসায় তুলকালাম কান্ড ঘটে যায়। আর ওর স্বামী নাসির এসব দেখেও নীরব হয়ে থাকে, মাঝে মধ্যে বাবা-মাকে সমর্থনও করে। বাপীর সাথে অনেকদিন পর দেখা করতে চেয়েছে বলে নাসির বলেছে এবার বাপীর বাড়ীতে গেলে যেন কখনোই মোনা স্বামীর কাছে ফিরে না আসে। 'বাপী, আমি একবিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত মেয়ে। Why do I have to take this trash, Bapi?' ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলে মোনা। 'আমি তোমার ছোট্ট মেয়ে হয়ে থাকতে চাই, বাপী, আর কখনও ও বাড়ীতে ফিরে যাবনা আমি।'

মুশতাক সাহেব যেন ধীরে ধীরে অনেক, অনেকদিনের ঘোর ভেঙ্গে জেগে উঠেন। একদিন তিনিও কি এমনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেননা স্ত্রী রাফিয়ার উপর? কোন অধিকারে তিনি রাফিয়ার উপর এমনি মানসিক অত্যাচার করতেন? কে দিয়েছিল তাঁকে পরের মেয়েকে জন্মদাতা পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার অধিকার? রাফিয়ার বাবা-মায়ের মনও কি একদিন তাঁরই কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়নি? আজ তার আস্বাদ তিনি নিজেও পাচ্ছেন। রাফিয়ার মৃতদেহ দেখবার সুযোগ পর্যন্ত তার মা-বোনদেরকে দেননি তিনি। স্ত্রীকে দাফন করেছিলেন তিনি লন্ডনেরই একটি মুসলিম গোরস্থানে। সবার অভিশাপে যে তাঁর নিজের জীবনে এখন কাল মেঘ! তিনি কি কখনও মাফ পাবেন রাফিয়া আর তার পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে?

জীবনে প্রথমবারের মত প্রচন্ড অপরাধের ভার বহন করে স্ত্রীর কবরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি। আজ তাঁর সব অহঙ্কার আর দম্ভের অবসান ঘটেছে। আজ তাঁর চেতনাবোধ হয়েছে।